

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

Communication Systems and Networking

২

দ্বিতীয় অধ্যায়

➤ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা	➤ প্রধান শব্দ গুচ্ছ
<ul style="list-style-type: none"> কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ডাটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। ডাটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে। ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ডাটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে। নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ব্যান্ড-উইড্থ(Band-Width) ট্রান্সমিশন (Transmission) কো-এক্সিয়াল (Co-axial) টুইস্টেড পেয়ার কেবল (Twisted Pair Cable) অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) রেডিও ওয়েভ (Radio Wave) মাইক্রোওয়েভ (Microwave) ব্লু-টুথ (Bluetooth) ওয়াই-ফাই (Wi-fi) ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-Max) নেটওয়ার্কিং (Networking) টোপোলজি (Topology) মডেম (Modem) হাব (Hub) রাউটার (Router) গেটওয়ে (Getway) সুইচ (Switch) NIC ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

আজকাল অফিসে বাসায় সর্বত্র কম্পিউটার এবং মোবাইলের ব্যবহার বিস্তার লাভ করেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম্পিউটার ও মোবাইল দিয়ে খুব সহজে তথ্য যেমন, কথা, চিঠি-পত্র, ফাইল, ছবি, ভিডিও প্রভৃতি আদান প্রদান করা যাচ্ছে। ফলে কম্পিউটার-এর শক্তি আর কম্পিউটার রুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন ইচ্ছা করলেই ঘরের কম্পিউটারে বসে দূরের কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। তাই এই পাঠের লক্ষ্য হল কম্পিউটারের তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানা।

ডাটা কমিউনিকেশন (তথ্য যোগাযোগ)

আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিভিন্ন রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে থাকি। যেমন আমরা কথা বলি এবং শুনি। কথা বলার ফলে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে আমাদের মনে থাকা তথ্যটি পৌঁছে যায়। আমরা দূরে কোথাও যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন অথবা ডাক ব্যবহার করি। সংবাদ জানার জন্য টেলিভিশন দেখি। এই সবই এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তথ্য স্থানান্তর করছে। একই ভাবে কম্পিউটারের সাহায্যেও তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো যায়। ডাটা কমিউনিকেশন হল তথ্যকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এটা কম্পিউটার বা যেকোনো ডিভাইস হতে অন্য আরেকটি কম্পিউটার বা যেকোনো ডিভাইসের মধ্যে হতে পারে।

ধরা যাক কোনো ব্যক্তি তার অফিসের আরো কয়েক জনের কাছে একটি চিঠি পাঠাতে চান। সে প্রথমে তার কম্পিউটারে চিঠিটি লিখবে। এই কম্পিউটারটি যদি ইন্টারনেটের (তথ্য যোগাযোগ মাধ্যম) সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সে মিনিটের মধ্যে তার চিঠিটি সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। অন্যরা ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়ে চিঠিটি কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস দিয়ে পড়তে পারবে। অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান যত দূরে বা কাছে হোক চিঠি বা ফাইল মুহূর্তেই আরেকজনের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে যদি তারা কমিউনিকেশন চ্যানেলের সাথে কোনো মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। আজকের ই-মেইলের মত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে কেবল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্ভবের ফলে। আর এই নেটওয়ার্ক হল কম্পিউটারের ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা।

ডাটা কমিউনিকেশনের (Data Communication) মৌলিক বিষয়সমূহ :

ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য নিচে উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন:

১. ম্যাসেজ (Message) -যে বার্তাটি তথ্য হিসেবে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হবে।
২. শ্রেক (source)- পাঠানোর জন্য তথ্য বা ম্যাসেজটা যে তৈরি করবে।
৩. মাধ্যম (medium)- যার ভেতর দিয়ে তথ্য বা ম্যাসেজটি যাবে।
৪. প্রাপক (receiver)-যে তথ্য বা ম্যাসেজটি গ্রহণ করবে।
৫. প্রোটোকল (Protocol)-যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তথ্য যোগাযোগ সংঘটিত হবে।

ডাটা কমিউনিকেশনে বহুল ব্যবহৃত চারটি মৌলিক পরিভাষা হচ্ছে:

১. তথ্য (Information)- যোগাযোগের মৌলিক জিনিস যা স্থানান্তরিত হবে।
২. সিগনাল (Signal)-তথ্যের তড়িৎ অথবা বেতারে রূপান্তরিত সংকেত।
৩. সিগনালিং (Signaling)- সংকেতকে কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে চালানো বা প্রচার করা।
৪. ট্রান্সমিশন (Transmission)- সিগনাল প্রক্রিয়াকরণ করে তথ্যের যে স্থানান্তর বা হস্তান্তর হল।

কমিউনিকেশন প্রোটোকল (Communcation Protocol):

মনে প্রশ্ন আসতে পারে যোগাযোগের যে সংযোগ রয়েছে তার ভেতর দিয়ে তথ্য আসলে কীভাবে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দেওয়া নেওয়া হয়? এটা আসলে হয় যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ সম্ভবপর হয়। এটা যোগাযোগ যন্ত্রকে নির্দেশ দেয় ঠিক কীভাবে এবং কী নিয়মে তথ্যকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিতে হবে। যোগাযোগ যন্ত্রগুলি এই নির্দেশনা মেনে তথ্য এক যন্ত্র হতে অন্য যন্ত্রে দেওয়া নেওয়া করে। তথ্য আদান প্রদানের জন্য যে নিয়ম কানুন আছে, যা আসলে সফটওয়্যার আকারে থাকে, তাকে বলা হয় প্রোটোকল।

নির্ভুল ও দক্ষতার সাথে ডাটা ট্রান্সমিশন করার জন্য কমিউনিকেশন সফটওয়্যার বা প্রোটোকল নীচের কাজগুলো করে থাকে।

১. ডাটা সিকোয়েন্সিং (Data Sequencing)- বড় তথ্যকে ছোটো ছোটো সুনির্দিষ্ট আকারে ভেঙে প্রেরণ করে যাতে ভুল না হয় এবং ভুল হলে সংশোধন করা যায়।
২. ডাটা রাউটিং (Data Routing)- তথ্য প্রেরণের পূর্বে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সবচে ভালো পথ খুঁজে বের করা।
৩. ফ্লো কন্ট্রোল (Flow Control)- তথ্য প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে গতির তারতম্য থাকতে পারে। ফ্লো কন্ট্রোল প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়া এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে গতির কম বেশি হওয়ার জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।
৪. ইরর কন্ট্রোল (Error Control)-কমিউনিকেশন প্রোটোকলের অন্যতম কাজ তথ্য আদান প্রদানে প্রক্রিয়ার ভুল শনাক্ত করা এবং তা সংশোধন করা। ইরর কন্ট্রোল নিশ্চিত করে যে, ডেটা ট্রান্সমিশন নির্ভুলভাবে হয়েছে।

ডাটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

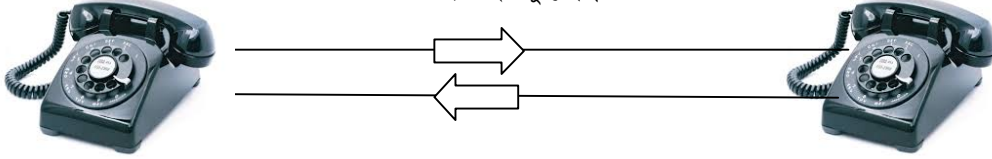
ডাটা ট্রান্সমিশন বলতে তথ্যের স্রোত বা ফ্লো কোন দিকে ধাবিত হবে বোঝায়। এই হিসেবে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে তথ্য প্রেরণ তিনভাবে হতে পারে যথা, ১. সিমপ্লেক্স ২. হাফ ডুপ্লেক্স ৩. ফুল ডুপ্লেক্স

১. সিমপ্লেক্স (Simplex)- কিছু ডিভাইস আছে শুধু তথ্য প্রেরণ অথবা শুধু গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তথ্য কেবল এক দিকে প্রেরিত হয়। তথ্য কোনো অবস্থায় উলটা দিকে ফিরে যেতে পারে না। একটি কিবোর্ড এবং কম্পিউটার বা কম্পিউটার থেকে মনিটরে আমরা এ ধরনের একমুখী তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ দেখি। টেলিভিশন সম্প্রচারও এরকম একমুখী।
২. হাফ ডুপ্লেক্স (Duplex)-এই সিস্টেমে তথ্য দুই দিকেই যেতে পারে তবে একই সময় দুই দিকে যেতে পারে না। প্রেরক যখন তথ্য পাঠায় তখন তথ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং তথ্য যখন গ্রহণ করে তখন প্রেরণ করতে পারে না। ওয়াকি টকি হল এই সিস্টেমের উদাহরণ। ওয়াকি-টকিতে একই সময়ে কেবল এক জন কথা বলতে পারে এবং এক জনের কথা শেষ হলে ওপরজন কথা বলতে পারে।

৩. **ফুল ডুপ্লেক্স(Full Duplex)**- এই সিস্টেমে তথ্য একই সময় উভয় দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভব। দুটি প্রান্ত প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য সংযোগ তৈরি করে এবং একই সময় তথ্য আদান প্রদান করে। ফলে পালা বদল করে তথ্য আদান প্রদান করার জন্য সময় নষ্ট হয় না এবং গতি বৃদ্ধি পায়। আমরা যে টেলিফোনে কথা বলি তাতে কথা বলা ও শোনা একই সাথে করা যায়। অর্থাৎ এতে ফুল ডুপ্লেক্স তথ্য আদান প্রদান হয়।



চিত্র নং- ১ হাফ ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশন



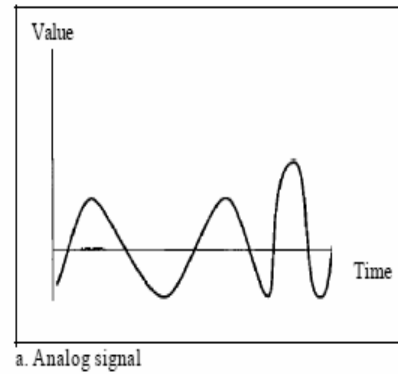
চিত্র নং- ২ ফুল ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশন

ডেটা ট্রান্সমিশন সিগনাল টাইপ (Data Transmission Signal Type)

ডেটা কমিউনিকেশনে তথ্য তড়িৎ সংকেত আকারে পরিবহণ মাধ্যম দ্বারা প্রবাহিত হয়। তথ্য যাওয়ার এই তড়িৎ সংকেত দুই প্রকারের হয় যথা, ১. অ্যানালগ ২. ডিজিটাল। ডিজিটাল কমিউনিকেশন ভালোভাবে বোঝার জন্য এই দুই প্রকার সংকেত আসলে কেমন এবং এর মৌলিক পার্থক্য জানা প্রয়োজন।

অ্যানালগ সিগনাল (Analog Signal Type):

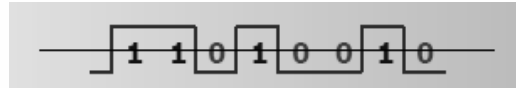
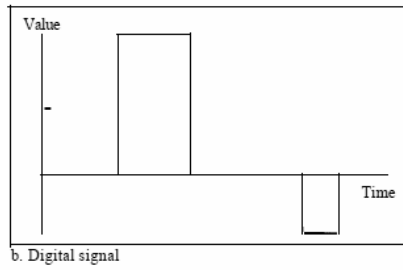
অ্যানালগ সিগনাল হল সময়ের সাথে অবিরতভাবে পরিবর্তনশীল। এটা শব্দের মতই অনেকটা। শব্দ আসলে বাতাসে এক প্রকার ঢেউ (wave) সৃষ্টি করে তড়িৎ-চুম্বকীয় সংকেতও ঠিক ওইরূপ (Analogous) ঢেউ সৃষ্টি করে। আমরা যখন অ্যানালগ টেলিফোনে কথা বলি তখন আসলে স্বরতন্ত্রী দিয়ে আমরা বাতাসে যে ঢেউ সৃষ্টি করি টেলিফোনের মাইক্রোফোন সেই বাতাসের কম্পনের চাপকে বিদ্যুৎ ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে এবং কম্পনের সাথে সাথে এটা সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে। তড়িৎ সংকেত শব্দের কম্পন বা ঢেউ(ওয়েভ) এর অনুরূপ (Analogous) হওয়ার কারণে এই প্রকার সংকেতকে অ্যানালগ (Analog) বলে।



চিত্র নং- ৩ অ্যানালগ সিগনাল

ডিজিটাল সিগনাল (Digital Signal):

ডিজিটাল সংকেত অ্যানালগের মত অবিরত নয় এবং এই সংকেতের মান সুনির্দিষ্ট ও আলাদা। এই ধরনের সংকেত-এ হয় সংকেত আছে নয় নেই। টেলিগ্রাফ এই ভাবে তথ্য পরিবহণ করে। টেলিগ্রাফে হয় শব্দ শোনা যায় নয় শব্দ শোনা যায় না। তা থেকে মোর্সকোড দিয়ে বার্তা পৌঁছে যায়। তড়িৎ সংকেতের ক্ষেত্রে এটা ভোল্টেজ আছে অথবা ভোল্টেজ নেই। আলোর ক্ষেত্রে আলো আছে বা আলো নেই। অ্যানালগ সিগনাল দিয়েও ডিজিটাল সিগনাল প্রেরণ করা যায় যেমন, বড় তড়িৎচুম্বকীয় সংকেতকে ১ এবং ছোটো তড়িৎচুম্বকীয় সংকেতকে ০। কম্পিউটারে ব্যবহৃত মডেম আসলে এভাবেই অ্যানালগ মাধ্যম দিয়ে ডিজিটাল সংকেত প্রেরণ করে।



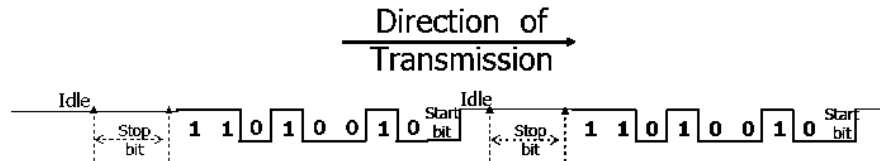
চিত্র নং- ৩ ডিজিটাল সিগন্যাল

ডাটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)

ডাটা ট্রান্সমিশন করার দুই প্রকার পদ্ধতি রয়েছে। যথা, ১. অ্যাসিনক্রোনাস ২. সিনক্রোনাস

১. অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous)-যুগপৎ নয়

এই পদ্ধতিতে একটি একটি করে অক্ষর প্রেরণ করা হয়। এই অক্ষর প্রেরণের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান সুনির্দিষ্টতা নেই। অক্ষর প্রেরণের শুরুতে আরম্ভ সংকেত(স্টার্ট বিট) এবং শেষ হলে সমাপ্তি সংকেত (স্টপ বিট) দেওয়া হয়। আমরা কিবোর্ডে টাইপ করার সময় এরকম দেখতে পাই। এই ধরনের সিস্টেম কম খরচে নির্মাণ করা যায় এবং তথ্য প্রেরণের সময় সংরক্ষণ করে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

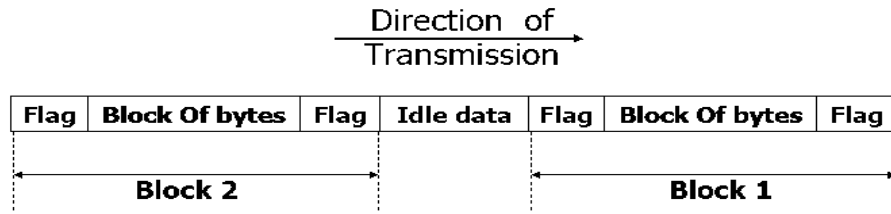


চিত্র নং- ৪ অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন

২. সিনক্রোনাস (Synchronous)-যুগপৎ

এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য অংশে অংশে ভাগ করে প্রেরণ করা হয়। এক একটি অংশে অনেকগুলি অক্ষর থাকতে পারে। সংকেত প্রেরণের শুরুতে প্রেরক এবং গ্রাহককে কখন সংকেত শুরু এবং শেষ হবে সেই সময়ের বিষয়ে সমন্বয় করতে হয়। এই সময় সমন্বয় করাকে বলে বিট

সিনক্রনাইজেশন, ফ্রেমিং অথবা ক্লকিং। এই সমস্বয় করাটা অনেকটা সংগীতের তাল এর মত। একটা তালে নির্দিষ্ট লয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বরকম্প থাকে। আমরা ব্যান্ড সংগীতে দেখতে পাই যে একজন অনেকগুলি ড্রাম ঢাম ঢাম বাজাচ্ছে। সে আসলে তাল রক্ষা করছে এবং অন্য বাদ্য যন্ত্রগুলি সেই তালে বাজানো হয়। যদি কেউ সেই তালে বাজাতে ব্যর্থ হয় তাহলে তা বেসুরো সংগীতে পরিণত হয়। সিনক্রনাস পদ্ধতিতেও এরকম নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সিগনাল/সংকেত প্রেরণ করতে হয়ে। সিনক্রনাস ক্লক এই সময় নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর থেকে বিচ্যুতি হলে তথ্য নষ্ট হয়ে যায়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ এবং দূরবর্তী যোগাযোগের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।



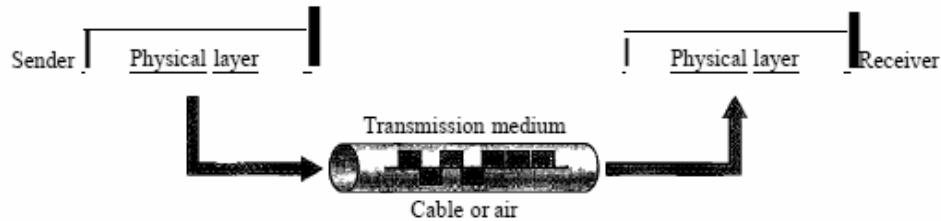
চিত্র নং- ৫ সিনক্রনাস ডেটা ট্রান্সমিশন

ব্যান্ড উইথ্ড(Band Width)

ব্যান্ড উইথ্ড হল তথ্য পরিবহণ ক্ষমতা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে তথ্য পরিবহণের হারকে ব্যান্ড উইথ্ড বলে। আমরা বাগানে পানি দেওয়ার হোস পাইপের সাথে এর তুলনা করতে পারি। পানির একই চাপে পাইপের ঘের যত বড় হবে তত বেশি পানি পাইপের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে। তেমনি তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে যত বেশি কম্পাঙ্ক হবে তত বেশি তথ্য পরিবহণ করবে। কমিউনিকেশন ডেটা পরিমাপক একক হচ্ছে বাউড(baud)। বাউড হল প্রতি সেকেন্ড বিট(bit) এর অনুরূপ, অর্থাৎ ৩০০ বাউড হল সেকেন্ডে ৩০০ বিট ডেটা।

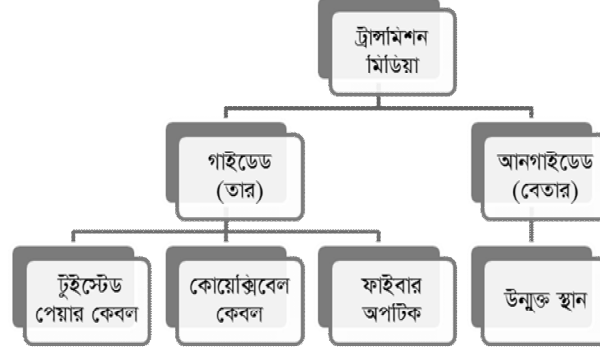
ট্রান্সমিশন মিডিয়া (Transmission Media)

ট্রান্সমিশন মিডিয়া(মাধ্যম) হল সেই সমস্ত জিনিস যার ভেতর দিয়ে তথ্য এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পরিবাহিত হতে পারে। দুজন মানুষ কথা বলছে তাদের কথা বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। হাতে লেখা চিঠি পৌছানোর জন্য ট্রাক, বিমান, ডাক বাহক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ডেটা কমিউনিকেশনে এই মাধ্যমগুলি অনেক সুনির্দিষ্ট। ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত ধাতব তার, ফাইবার অপটিক এবং উন্মুক্ত স্থান ব্যবহার করা হয়।



চিত্র নং- ৬ ডেটা ট্রান্সমিশন মিডিয়া(মাধ্যম)

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আমরা ট্রান্সমিশন মিডিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যথা, ১. গাইডেড মিডিয়া ২. আনগাইডেড মিডিয়া। গাইডেড মিডিয়ার মধ্যে আছে কোয়েক্সিবেল কেবল, টুইস্টেড পেয়ার কেবল। আনগাইডেড মিডিয়াতে আছে খোলা জায়গা।



গাইডেড ট্রান্সমিশন (Guided Transmission Media):

যে মিডিয়া বা মাধ্যমগুলি তথ্য প্রবাহের জন্য দুটি ডিভাইসের মধ্যে একটা প্রণালি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় গাইডেড মিডিয়া। পানির পাইপের ভেতর দিয়ে যখন পানি প্রবাহিত হয় তা পাইপের বাইরে যেতে পারে না এবং পাইপ যেভাবে বসানো হয়েছে ঠিক সেভাবেই পানিকে প্রবাহিত হতে হয়। এরকম গাইডেড মাধ্যমে মাধ্যমটির ভেতর (ফিজিক্যাল) অবস্থানের ভেতরেই তড়িৎ সংকেত প্রবাহিত হয়। গাইডেড মিডিয়া তিন ধরনের:

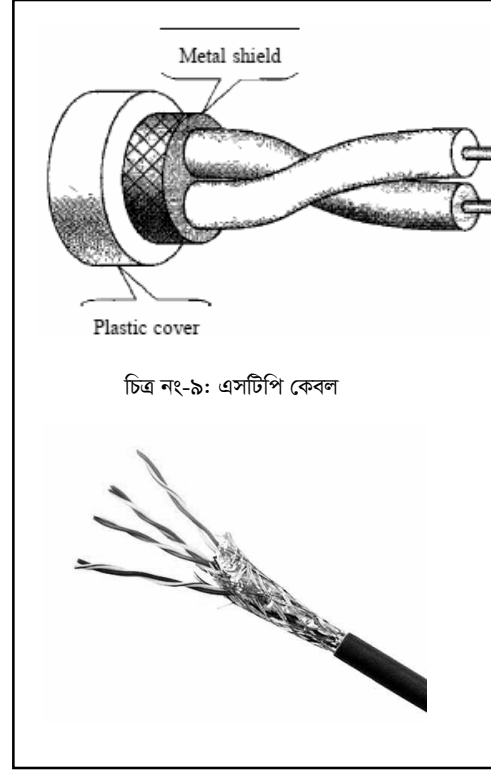
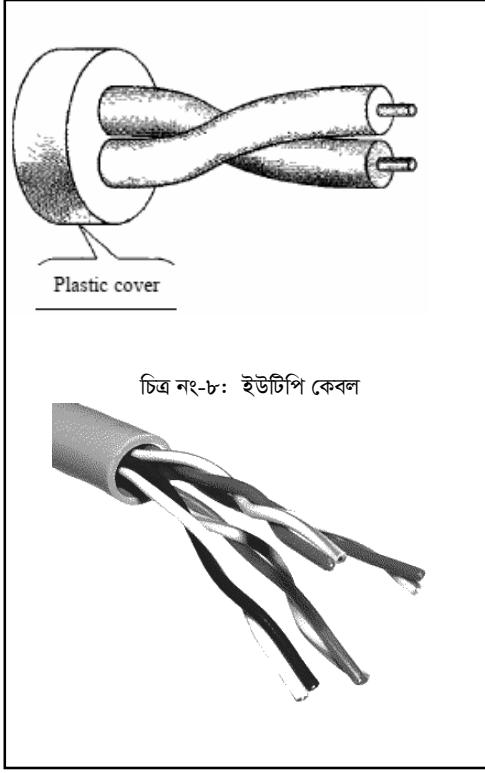
ক. টুইস্টেড পেয়ার কেবল (Twisted Pair Cable)

টুইস্টেড পেয়ার কেবলে আসলে এক জোড়া তামার তার এক সাথে মোচড়ানো অবস্থায় থাকে। টেলিফোনের লোকাল সংযোগ দেওয়ার জন্য এই তার ব্যবহার হয়। ১০০ মিটার দূরত্বে এধরনের তার সেকেন্ড ৯৬০০ বিট তথ্য প্রবাহিত হতে পারে।



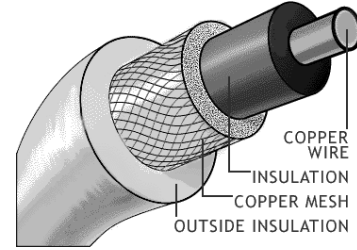
চিত্র নং-৭: টুইস্টেড পেয়ার কেবল

দুই প্রকার টুইস্টেড পেয়ার কেবল পাওয়া যায় যথা, ইউটিপি (UTP) এবং এসটিপি (STP)। এই কেবলগুলি একাধিক জোড়া তারের সমন্বয়ে তৈরি। তড়িৎচুম্বকীয় সিগন্যাল কেবলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বাইরের তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি দ্বারা বাধা গ্রস্ত হয়। এসটিপি কেবল বাইরের নয়েস বা তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির বাধা থেকে রক্ষা করানোর জন্য একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের লেয়ার থাকে। স্বস্তা ও ব্যবহার করা সহজ বিধায় এটা বেশ জনপ্রিয় একটা মিডিয়া।



খ. কোয়েক্সিয়াল কেবল (Coaxial Cable)

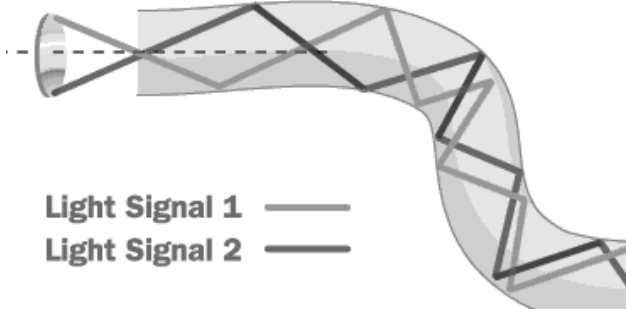
কোয়েক্সিয়াল কেবল এক ধরনের বিশেষভাবে মোড়াকিকরণ করা তার যা অধিক গতিতে তথ্য ট্রান্সফার করতে পারে। এই তারের কেন্দ্রের তামার তার থাকে যার চারপাশে নিরোধক দিয়ে জড়ানো থাকে। এই নিরোধকের চারপাশে আবার তামার জালিকা দেওয়া থাকে যা একই সাথে কন্ডাক্টর ও নয়েস নিরোধক হিসেবে কাজ করে। এর উপরে স্তরে সর্বশেষ নিরোধকটি জড়ানো থাকে।



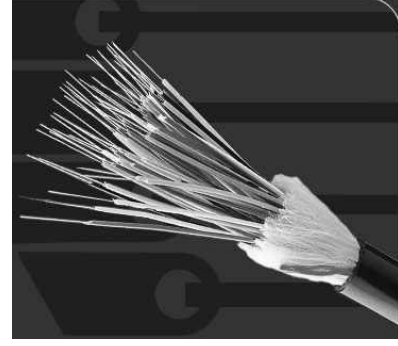
চিত্র নং- ১০ কোয়েক্সিয়াল কেবল

গ. ফাইবার অপটিক (Fiber Optic)

ফাইবার অপটিক গ্লাস দিয়ে তৈরি মানুষের চুলের মত চিকন এক ধরনের তার যার ভেতর দিয়ে আলোর সংকেত আকারে তথ্য প্রবাহিত হতে পারে। অপটিকাল ফাইবারের কেন্দ্রে থাকে গ্লাস দিয়ে তৈরি কোর। এই কোরের চারিদিকে থাকে ক্ল্যাডিং স্তর যাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে কোরে ফিরে যায়। সবার উপরে থাকে বাফারিং কোটিং যা তারটিকে বাহ্যিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। উল্লেখ্য ফাইবার কোর গ্লাসের স্থলে প্লাস্টিক দিয়েও তৈরি হয়।

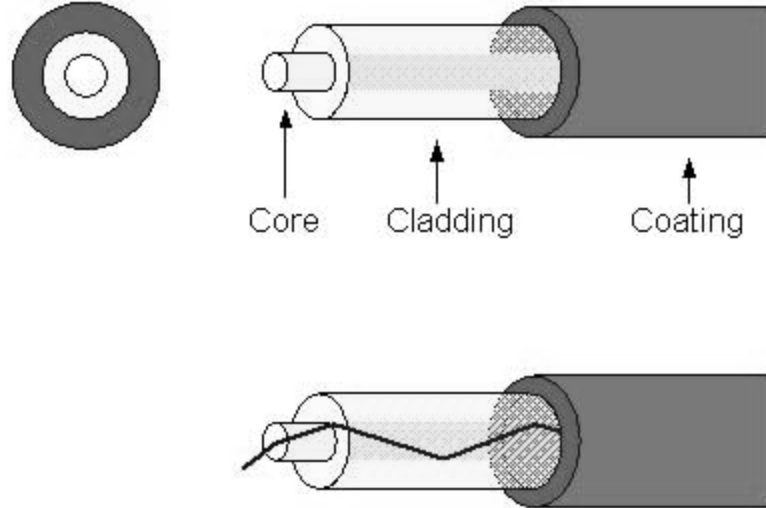


চিত্র নং- ১১ অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর প্রতিফলন



চিত্র নং- ১২ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল

অপটিক্যাল ফাইবার প্রধানত দুই প্রকার হয় যথা, সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার এবং মাল্টি মোড অপটিক্যাল ফাইবার। মাল্টি মোড অপটিক্যাল ফাইবার আকারে ৫০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে বেশি হয়। এই ফাইবারের দাম একটু বেশি, একটু কম নিখুঁত কাজ করে এবং দুই প্রান্তে তুলনামূলক কম মূল্যের কানেক্টর ও প্রেরক এবং গ্রাহক যন্ত্র লাগে। সাধারণত মাল্টিমোড ফাইবারে ২০০০ মিটার দূরত্বে সেকেন্ডে ১০০ Mb(মেগাবিট), ১০০০ মিটার দূরত্বে সেকেন্ডে ১ গিগাবিট এবং ৫৫০ মিটার দূরত্বের সেকেন্ডে ১০ গিগাবিট তথ্য পরিবহণ করতে পারে। সিঙ্গেলমোড অপটিক্যাল ফাইবার সাধারণত ৮ থেকে ১০ মাইক্রোমিটারের হয় এবং এর সাথে সংযুক্ত যন্ত্রপাতির দাম তুলনামূলক বেশি। তবে সিঙ্গেলমোড ফাইবার অনেক দূরত্বে অনেক বেশি তথ্য প্রেরণ করতে পারে।



চিত্র নং- ১৩ অপটিক্যাল ফাইবারের বিভিন্ন অংশ

অন্য মাধ্যম হতে ফাইবার অপটিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণসমূহ:

- ফাইবার অপটিক ব্যবহার করে অন্য গাইডেড মাধ্যম হতে অনেক উচ্চ গতিতে তথ্য প্রেরণ করা সম্ভব। বর্তমানে ফাইবার অপটিক তথ্য প্রেরণ ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা পূর্ণ ব্যবহার করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র নেই।

- ফাইবার অপটিকে সিগনাল বা সংকেত কম দুর্বল হয়। ফলে অন্য গাইডে মাধ্যম হতে অনেক বেশি দূরত্বে সিগনাল পাঠানো যায়। রিপিটার ছাড়াই প্রায় ৫০ কিমি দূরত্বে সিগনাল প্রেরণ করা যায় যেখানে কোয়েক্সিয়াল বারে মাত্র ৫ কিমি।
- তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি এই সিগনালে কোনো রকম ইন্টারফিয়ারেন্স বা সংঘর্ষ ঘটতে পারে না।
- ক্ষয় সৃষ্টি করে এমন পদার্থ প্রতিরোধ করতে পারে। গ্লাস তামা হতে অনেক বেশি ক্ষয় প্রতিরোধী।
- অন্য কেবল হতে অনেক হালকা।
- অগ্নি-স্কুলিস্ট সৃষ্টি করে না। সুতরাং এই থেকে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা নেই।
- অপটিকাল ফাইবার কোনো তড়িৎ চুম্বকীয় আবশ্য সৃষ্টি করে ফলে এর থেকে কোনো নয়েসও সৃষ্টি হয় না।
- অপটিকাল ফাইবারে থেকে কোনো তথ্য বের করে নেওয়া সম্ভব নয়।
- হালকা ও নমনীয় হওয়ায় এই কেবল লাগানো সহজ।
- অন্য গাইডেড মাধ্যম হতে অধিক তাপ ও বিকিরণ সহ্য করতে পারে। তাই বিরুদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করা যায়।
- সংকেত প্রেরণে ভুলের মাত্রা কম হয়।

আনগাইডেড(Unguided)- বেতার/Wireless:

আনগাইডেড মাধ্যম ভৌত কোনো মাধ্যম ছাড়াই তড়িৎচুম্বকীয় সংকেত প্রেরণ করে। এই মাধ্যমকে সাধারণত ওয়্যারলেস বা বেতার বলে। এতে তড়িৎ শক্তি চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অ্যান্টেনার থেকে বিকিরণ হয়। সংকেত খোলা জায়গা দিয়ে প্রেরিত হয় এবং এরকম সংকেত গ্রহণ করতে সক্ষম যন্ত্র যার কাছেই থাকবে সে তথ্য গ্রহণ করতে পারবে। আমরা যে রেডিও শুনি তা আসলে ওয়্যারলেস সংকেত এবং যাদের রেডিও আছে সবাই এই তথ্য সংকেত গ্রহণ করে রেডিও শোনে। এই সংকেতের তরঙ্গের প্রতি সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা হল ফ্রিকোয়েন্সি।

ওয়্যারলেস সংকেত প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত কয়েকেটি উপায়ে যায়। প্রথমত ভূমি থেকে প্রেরণ করা হয় এবং সংকেত প্রেরক অ্যান্টেনা থেকে বৃত্তাকারে ভূমির বক্রতা অনুসারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সংকেত শক্তি যত বেশি তত দূরত্বে তা অতিক্রম করতে পারবে। দ্বিতীয়ত সংকেত আকাশের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং আয়নক্ষিয়ার থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে তা ভূমিতে ফিরে আসবে। এই ভাবে অল্প শক্তি ব্যবহার করেও অনেক দূর পর্যন্ত বেতার সংকেত পাঠানো যায়। তৃতীয়ত বেতার তরঙ্গ দৃষ্টি-রেখার মধ্যে সোজাসুজি প্রেরণ করা হয়। দুজন মানুষ যখন পরস্পরকে কোনো বাধা ছাড়াই দেখে তখন তাদের দৃষ্টির মধ্যে একটা রেখা কল্পনা করা যায়। তাকে আমরা বলি লাইন অব সাইট (Line-of-sight)। কোনো বাধা যেমন দেয়াল বা গাছ থাকলে এই রেখা কল্পনা করা যায় না। দুটি পরস্পরমুখী অ্যান্টেনার মধ্যেও এরকম রেখা কল্পনা করা যায়।



ভূমি থেকে
(২ মেগাহার্টজের নীচে)



আকাশ হতে
(২ থেকে ৩০ মেগাহার্টজ)



দৃষ্টি-রেখা বরাবর
(৩০ মেগাহার্টজের বেশি)

চিত্র নং- ১৪ ওয়্যারলেস সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের বিভিন্ন উপায়

ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে বেতার তরঙ্গকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)

৩ কিলোহার্টজ হতে ৩০০ কিলোহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গকে রেডিও ওয়েভ বলে। রেডিও ওয়েভ সর্বদিকে প্রবাহিত হয় ফলে প্রেরক এবং গ্রাহক অ্যান্টেনাকে কোনো নির্দিষ্ট দিকমুখী করার প্রয়োজন হয় না। এজন্য সীমার মধ্যে যেকোনো গ্রাহক যন্ত্র এই সংকেত গ্রহণ করতে পারে। এতে অসুবিধা হল একই ফ্রিকোয়েন্সিতে একাধিক প্রেরক থাকলে তাদের মধ্যে ইন্টারফিয়ারেন্স (সংঘর্ষ) হয়।

রেডিও ওয়েভ অনেক দূর পর্যন্ত সংকেত নিয়ে যেতে পারে। আকাশে প্রতিফলনের মাধ্যমে পাঠানো রেডিও ওয়েভ দূরবর্তী স্থানে রেডিও সম্প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। লো ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভ দেয়াল ভেদ করে যেতে পারে। এতে সুবিধা হয় যে এএম রেডিও বিল্ডিং-এর ভেতরে বসে শোনা যায় কিন্তু অসুবিধা হল প্রয়োজন পড়লে ভেতর ও বাহিরের যোগাযোগ আলাদা করা সম্ভব হবে না।

২. মাইক্রো ওয়েভ (Micro Wave)

১ গিগাহার্টজ থেকে ৩০০ গিগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিকে মাইক্রো ওয়েভ বলে। মাইক্রো ওয়েভ একমুখী এবং ছোটো আকারের কেন্দ্র অভিমুখে সিগনাল পাঠানো যায়। এজন্য প্রেরক ও গ্রাহক অ্যান্টেনাকে পরস্পরমুখী করে সাজাতে হয়। এতে সুবিধা হল এক জোড়া গ্রাহক ও প্রেরক অ্যান্টেনা অন্য কোনো অ্যান্টেনার সাথে সংঘর্ষ (ইন্টারফিয়ারেন্স/Interference) না ঘটিয়ে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। মাইক্রো ওয়েভ পাঠানোর জন্য প্রেরক ও গ্রাহকে দৃষ্টি-রেখার মধ্যে থাকতে হয়। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে বেশি দূরত্ব হলে অ্যান্টেনা অনেক উঁচুতে উঠানো লাগে। এইরূপ সংকেত বিল্ডিং ভেদ করে যেতে পারে না।

৩. ইনফ্রারেড (Infrared)

৩০০ গিগাহার্টজ হতে ৪০০ টেরাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা হয় ইনফ্রারেড। এটা স্বল্প দূরত্বে উচ্চ গতিতে যোগাযোগের জন্য। এর সংকেত বিল্ডিং ভেদ করতে পারে না ফলে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ইন্টারফিয়ারেন্স ঘটায় না। যেমন আমরা ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে টিভি চালানোর সময় আমাদের প্রতিবেশীর রিমোট কন্ট্রোল কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। এরকম সংকেত সূর্য রশ্মিতেও থাকে তাই ঘরের বাইরে ব্যবহার করতে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এটা দিয়ে উচ্চ গতিতে ডিজিটাল ডেটা পাঠানো সম্ভব। ইনফ্রারেড ব্যবহার করে ওয়্যারলেস কিবোর্ড, মাউস ও প্রিন্টার তৈরি করা যায়।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন (Wireless Communication)

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা। আগে এক সময় আমরা সীমিত পরিমাণ মানুষ ফিক্সড ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করতাম এখন মোবাইল ফোন সবার হাতে হাতে। তারবিহীন হওয়ায় এই ব্যবস্থা এবং চলন্ত অবস্থায় ব্যবহার করা যায় বলে বেতার যোগাযোগের জনপ্রিয়তা এবং প্রয়োজনীয়তা কেবলই বাড়ছে। এর ফলে যেসব জায়গায় ল্যান্ডফোন স্থাপন ব্যয় সাপেক্ষ কিংবা অসম্ভব ছিল সেখানেও যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে গেছে।

মোবাইল কমিউনিকেশন (Mobile Communication)

২০১২ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোবাইল ফোন আছে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ। মোবাইল কমিউনিকেশন সহজলভ্য এবং সুবিধাজনক হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়ের দেশে মোবাইল ফোন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মোবাইল কমিউনিকেশন বলতে চলমান অবস্থায় তথ্য বিনিময় করার জন্য যে তার বিহীন প্রযুক্তি রয়েছে তাকে বোঝায়। এরকম মোবাইল তথ্য যোগাযোগের জন্য আমরা মোবাইল ফোন ও মোডেম ব্যবহার করে থাকি। ১৯৭৩ মোটোরোলা কোম্পানির গবেষক ড. মার্টিন কুপার প্রথম যে মোবাইলটি প্রদর্শন করেন প্রায় ১ কেজি--বর্তমানে সকল মোবাইল ফোনই পকেটে নিয়ে বেড়ানো যায়।

মোবাইল কমিউনিকেশন সিস্টেমের কেন্দ্রে একটা প্রেরক ও গ্রাহক বেজ স্টেশন থাকে। বেজ স্টেশনের কাভারেজ এরিয়াকে সেল বলে। এরকম বেজ স্টেশন অনেকগুলি তৈরি করে মোবাইল কোম্পানিগুলি বড় কাভারেজ এরিয়া তৈরি করে। মোবাইল ব্যবহারকারীরা যখন চলন্ত অবস্থায় থাকে তখন কাছাকাছি সবচে ভালো বেজ স্টেশনের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এবং তথ্য বিনিময় করে।

মোবাইল ফোনের উদ্ভাবের পর থেকে এ-পর্যন্ত চারটি প্রজন্ম ভাগ করা হয়েছে--

ক. প্রথম প্রজন্ম (1st Generation)

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোনগুলি ছিল সেলুলার নেটওয়ার্ক ভিত্তিক। ১৯৭৯ সালে জাপানের এনটিটি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চালু করে। নব্বই দশকের আগ পর্যন্ত এই সিস্টেমের মোবাইল ফোন চলতে থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

অ্যানালগ পদ্ধতির নেটওয়ার্ক

- সেলুলার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক
প্রথম দিকে ওজন বেশি এবং ধীরে ওজন কমে থাকে
- সেমিকন্ডাক্টর এবং মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার

খ. দ্বিতীয় প্রজন্ম (2nd Generation)

জিএসএম স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে ১৯৯০ সালে টুজি নেটওয়ার্ক চালু হয়। এতে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এই প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং তথ্য উভয়ে বিনিময় করা সম্ভব হল। টেকস্ট ম্যাসেজিং চালু হয় এই প্রজন্ম থেকেই। সিডিএমএ২০০০, জিপিআরএস, ইডিজিই প্রযুক্তিসমূহ এই প্রজন্মে উদ্ভব হয়।

বৈশিষ্ট্য

- ডিজিটাল ট্রান্সমিশন (Digital Transmission)
- ভয়েস ও ডেটা কমিউনিকেশন (Voice and Data Communication)
- মিডিয়া কন্টেন্ট অ্যাকসেস সুবিধা (Media Content Access Facility)
- মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেম (Mobile Payment System)

গ. তৃতীয় প্রজন্ম (3rd Generation)

মোবাইলে ডেটা সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির আসে। ২০০০ সালের পর থেকে এই প্রজন্মের উদ্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে থ্রিজি মোবাইল ২.৪ থেকে ৩.১ মেগাবিট পার সেকেন্ড গতিতে তথ্য ডাউন লিংক (গ্রহণ) ট্রান্সফার করতে পারত যা বর্তমানে এইচএসপিডিএ প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ ১৪ মেগাবিট পার সেকেন্ড।

বৈশিষ্ট্য

- ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য সার্কিট সুইচিং-এর স্থলে প্যাকেট সুইচিং চালু হয়
- উচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সফার রেট
- এরই প্রজন্মে WCDMA, CDMA2000, HSPA, HSDPA, HSDPA+, UMTS ইত্যাদি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে।
- প্রোটোকলের উন্নয়নের ফলে সংযোগ স্থাপন সময় কমে আসে
- কোয়ালিটি অব সার্ভিস এর গোড়াপত্তন ঘটে

ঘ. চতুর্থ প্রজন্ম (4th Generation)

উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ক্রমশ চাহিদা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধির ফলে ফোরজি এর আবির্ভাব। ২০১০ সালে বলা হয় HSDPA+ আসলে চতুর্থ প্রজন্মের যার সর্বোচ্চ গতি ৮৪ মেগাবিট পার সেকেন্ড। বর্তমানে ওয়াইমেক্স এবং টিএলই হল চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক।

বৈশিষ্ট্য

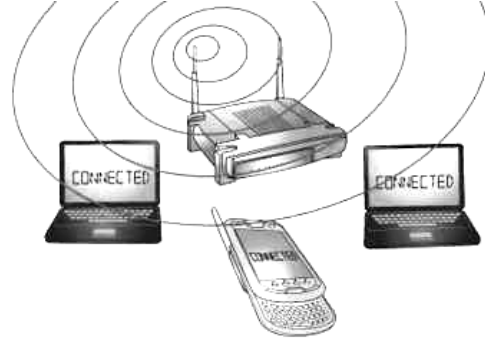
- এটা পুরোপুরি আইপি নেটওয়ার্ক।
- সর্বোচ্চ ১০০ মেগাবিট গতিতে কাজ করতে পারে।
- ডাইনামিক্যালি নেটওয়ার্কের রিসোর্স শেয়ার ও ব্যবহার করতে পারে ফলে প্রতিটি বেজ স্টেশনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়।
- এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে সংযোগে কোনো ব্যাঘাত ছাড়াই প্রবেশ করতে পারে।
- হাই ডেফিনেশন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের জন্য উন্নত কোয়ালিটি অব সার্ভিস।

❖ Bluetooth

স্বল্প দূরত্বে এবং শক্তিতে ফোন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন পেরিফেরালস এর ওয়্যারলেস যোগাযোগের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড। ব্লুটুথ নামটা এসেছে ১০০০ বছর আগে ডেনমার্কের রাজা হেরাল্ড ব্লুটুথ থেকে। এই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি ডিভাইসগুলি কঠোর নিরাপত্তাসহ পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করে যোগাযোগ করতে পারে খুব সহজে। ব্লুটুথ স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ এর স্ট্যান্ডার্ড ব্যবস্থাপনা করে। মোবাইল টু মোবাইল ডাটা ট্রান্সফার এর জন্য ব্লুটুথ আমাদের সবার কাছেই পরিচিত। ব্লুটুথ ব্যবহার করে কিবোর্ড, মাউস, ফোন, প্রিন্টার, হেডসেট ইত্যাদি ডিভাইস আমরা কম্পিউটারে সাথে সংযোগ দিতে পারি।

WiFi ওয়াই-ফাই

ওয়াই-ফাই হলো ওয়্যারলেস অন্তর্ভুক্ত পণ্য তৈরি করার জন্য ওয়াই-ফাই অ্যালায়েন্সের একটা স্ট্যান্ডার্ড। ওয়াই-ফাই আছে এমন পণ্য ছোটো পরিসরের ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে। ওয়্যারলেস রাউটার দিয়ে একটা এলাকাকে (বিল্ডিং বা ক্যাম্পাস) নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। যেসব কম্পিউটার ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মোডেম আছে তারা নেটওয়ার্কে তার ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে। নেটওয়ার্ক যদি সবার জন্য উন্মুক্ত না হয় তাহলে নিরাপত্তার জন্য পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে। নেটওয়ার্কে সংযোগের ব্যবস্থা মোটামুটি স্বয়ংক্রিয়। যে স্থানে এরকম ওয়্যারলেস সংযোগের ব্যবস্থা থাকে তাকে হট-স্পট বলা হয়।



চিত্র নং- ১৫: ওয়াই-ফাই হটস্পট

ওয়াইম্যাক্স WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

ওয়াইম্যাক্স হচ্ছে উচ্চগতির তথ্য যোগাযোগের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড। প্রাথমিক ভাবে ৩০ থেকে ৪০ মেগাবিট পার সেকেন্ড গতির জন্য তৈরি হলেও ২০১১ সালে ফিক্সড স্টেশনের জন্য ১ গিগাবিট পার সেকেন্ড-এর উন্নীত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেবল এবং ডিএসএল এর বিকল্প হিসেবে এই প্রযুক্তির উদ্ভব। ওয়াইম্যাক্স ফোরাম নির্ধারিত আদর্শ অনুসরণ করে যে ওয়্যারলেস ডিভাইসগুলি তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয় ওয়াইম্যাক্স ডিভাইস। ওয়াইম্যাক্স ডিভাইসগুলি একটা সার্বজনীন আদর্শ ব্যবহার করার ফলে উৎপাদক ভিন্ন হলেও একটির সাথে আরেকটি সহজেই কাজ করতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটারের ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এই যন্ত্রটি দ্বারা তথ্য যোগাযোগ সম্ভব। আমরা টেলিফোন দিয়ে হয়তো কথা বলতে পারি কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারি আবার তা অন্য কম্পিউটারে পাঠাতে পারি। বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিভিন্ন ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। তাই এসম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন।

নেটওয়ার্ক হল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বিত এমন এক ব্যবস্থা যা দ্বারা তথ্য এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে স্থানান্তর করা যায়। তার বা তার বিহীন মাধ্যম যেমন, কবল, মোডেম, স্যাটেলাইট ইত্যাদি দ্বারা

কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্র সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটার দিয়ে চিঠি, বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেমন লেখা, ছবি, শব্দ, ভিডিও প্রভৃতি অন্য কম্পিউটারে পাঠানো যায়। এক কম্পিউটার দিয়ে অন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যে কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারকে কোনো সার্ভিস দেয় তাকে সার্ভার বলে। নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলিকে বলে নোড (node)।

নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

১. তথ্য বিনিময়
২. হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং
৩. স্টোরেজ রিসোর্স শেয়ারিং
৪. তথ্যের নিরাপত্তা
৫. বার্তা বিনিময়

বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা

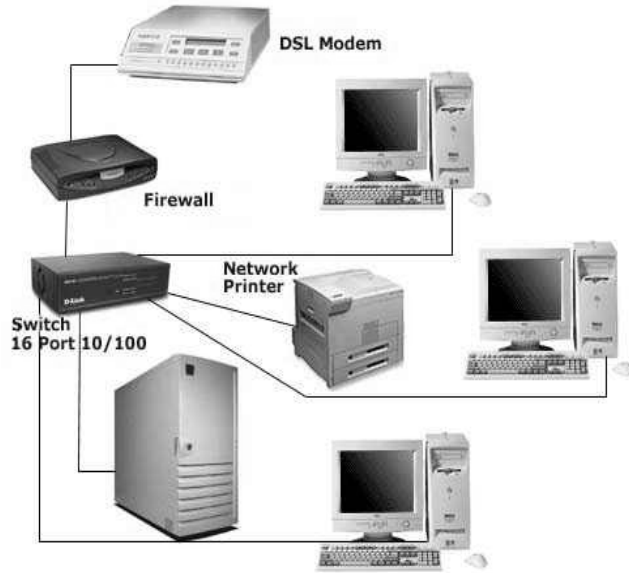
বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তিন ধরনের।

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN)
৩. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN)

নীচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল-

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network)

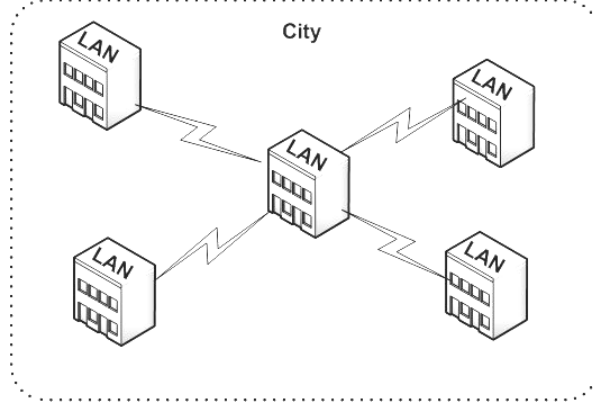
লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হলো ছোটো পরিসরে যে কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক। সাধারণত একটা বিল্ডিং বা ক্যাম্পাসের মধ্যে এ ধরনের নেটওয়ার্ক সীমাবদ্ধ থাকে। কম্পিউটারগুলি একটি আরেকটির সাথে তথ্য শেয়ার করতে পারে এবং নেটওয়ার্কে সংযুক্ত বিভিন্ন রিসোর্স যেমন মোডেম, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিসে, ল্যাবে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এধরনের নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য সুইচ বা হাব, কেবল, কানেক্টর, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই ডিভাইসগুলি সাধারণত বাজারে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়।



চিত্র নং- ১৬ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক(Metropolitan Area Network)

যখন একই শহরের একাধিক লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক(MAN) বলা হয়। টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে অথবা নতুন কেবল বা ওয়্যারলেস সিস্টেম বসিয়ে ল্যানগুলিকে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে একই শহরে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বাইরে তথ্য যোগাযোগ সম্ভব হয়।



চিত্র নং- ১৭ মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network)

যখন অনেক দূরত্বের ল্যান এবং ম্যানগুলি সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। এই ধরনের নেটওয়ার্ক শহর ছাড়িয়ে বিশ্বের যেকোনো স্থানে বা দূরত্বে হতে পারে। কপার কেবল, অপটিকাল ফাইবার ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ইত্যাদি দ্বারা অনেক দূরের নেটওয়ার্কগুলিকে সংযুক্ত করা হয়। আসলে পৃথিবী বিস্তৃত এই নেটওয়ার্কই ইন্টারনেট।



চিত্র নং- ১৮ মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক

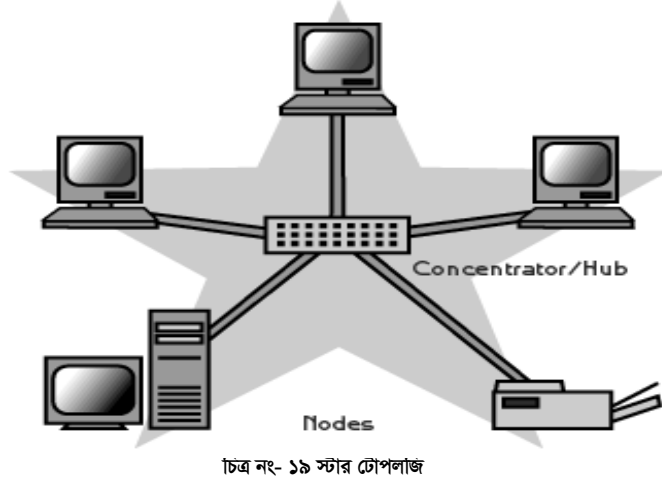
নেটওয়ার্ক টোপোলজি

নেটওয়ার্কে কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইস যেভাবে সংযোগ করা হয় তার লেআউট বা নকশা বা বিন্যাসকে নেটওয়ার্ক টোপোলজি বলে। নেটওয়ার্কে ছয় প্রকার টোপোলজি আছে। যথা,

১. স্টার টোপোলজি (Star Topology)
২. রিং টোপোলজি (Ring Topology)
৩. বাস টোপোলজি (Bus Topology)
৪. ট্রি টোপোলজি (Tree Topology)
৫. মেশ টোপোলজি (Mesh Topology)
৬. হাইব্রিড টোপোলজি (Hybrid Topology)

স্টার টোপোলজি (Star Topology)

স্টার টোপোলজিতে কম্পিউটার ও ডিভাইসগুলি একটি কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে। কেন্দ্রে থাকে একটা নেটওয়ার্ক সুইচ বা হাব। এই সুইচ কম্পিউটারগুলির মধ্যে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করবে। কম্পিউটারের তথ্য প্রথমে সুইচে যাবে এবং সুইচ থেকে যে কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে তথ্য পাঠানো হচ্ছে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। আমরা যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক দেখি তা আসলে এই স্টার টোপোলজি ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়।



চিত্র নং- ১৯ স্টার টোপোলজি

সুবিধা

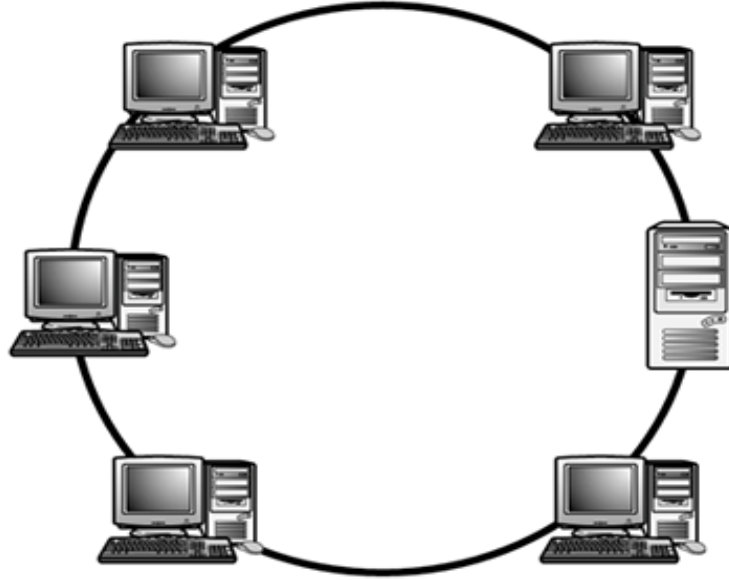
- সহজেই অনেক কম্পিউটার সংযোগ করা যায়।
- নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার নষ্ট হলেও নেটওয়ার্ক সচল থাকে।
- হাব/সুইচ বিভিন্ন ধরনের কেবল ব্যবহারের সুবিধা দেয় তাই একই সাথে অনেক রকম কেবল ব্যবহার করা যায়।
- স্টার টোপোলজি ব্যবহার করে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যবহারকারীরাও দ্রুত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারেন।

অসুবিধা

এই টোপোলজিতে তার বেশি লাগে ফলে খরচ বেশি। কেন্দ্রে থাকা সুইচ বা হাবটি নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে যায়।

রিং টোপোলজি (Ring Topology)

আমরা হাতে হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়ালে যেমন হয় রিং টোপোলজি অনেকটা সেরকম। রিং টোপোলজিতে প্রত্যেক কম্পিউটার তার দুই পাশের কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে যা শেষ পর্যন্ত একটা বৃত্তাকার অবস্থার মত হয়। প্রতিটি কম্পিউটারে একটি রিসিভার এবং একটি ট্রান্সমিটার বা রিপিটার থাকে। রিপিটারের দায়িত্ব হল তথ্য যদি তার না হয় তাহলে পরের কম্পিউটারটিতে পাঠিয়ে দেয়া।



চিহ্ন নং- ২০ রিং টোপোলজি

সুবিধা

কম্পিউটারগুলির নেটওয়ার্কে সমান ভূমিকা থাকে

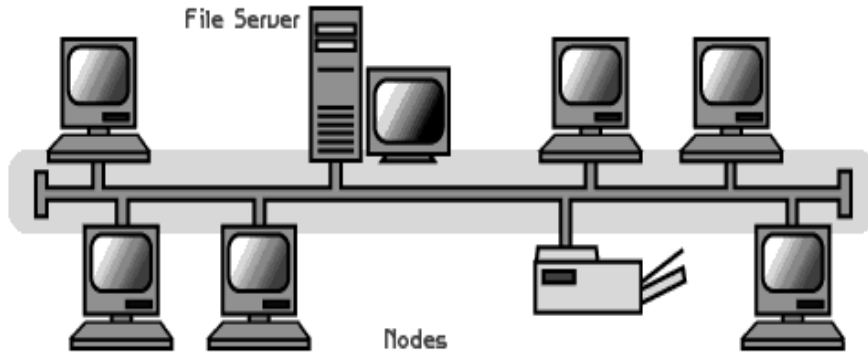
প্রতিটি কম্পিউটার সিগনালকে রিপিট করে বিধায় সিগনাল অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

অসুবিধা

একটা কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্কই অচল হয়ে যাবে।

বাস টোপোলজি (Bus Topology)

একটি সংযোগ তারের সাথে কম্পিউটারগুলি সংযুক্ত থাকে। কোনো কম্পিউটার কোনো তথ্য প্রেরণ করলে সেটা সবগুলি কম্পিউটারে যায়। তথ্যটি যে কম্পিউটারে সে গ্রহণ করে বাকিগুলি ফেলে দেয়। এই ধরনের নেটওয়ার্কে একই সময়ে কেবল একটি কম্পিউটার তথ্য প্রেরণ করতে পারে। একটির শেষ হলে আরেকটি কম্পিউটার তথ্য প্রেরণ করতে পারে।



চিহ্ন নং- ২০ বাস টোপোলজি

সুবিধা

- ছোটো খাটো নেটওয়ার্ক স্বল্প ব্যয়ে তৈরি করা যায়।
- কম দৈর্ঘ্যে কেবল লাগে।
- বাসের সাথে শুধু বিএনসি ক্যাবল কানেক্টর ব্যবহার করে নতুন কম্পিউটার সংযোগ করা যায়।

অসুবিধা

- নেটওয়ার্ক ব্যবহার বেশি হলে পারফরমেন্স খুব খারাপ হয়ে যায়।
- প্রতিটি ব্যারেল কানেক্টর সিগনাল দুর্বল করে দেয়।
- এই ধরনের নেটওয়ার্ক ট্রাবলশুট করা কষ্টকর।

ট্রি টোপোলজি (Tree Topology)

ট্রি টোপোলজিতে কম্পিউটারগুলি হাইয়ারকিক্যাল অর্ডারে সাজানো থাকে। এখানে একটা কম্পিউটার থাকে মূল। তার অধীনে একাধিক কম্পিউটার সংযুক্ত হতে পারে। এই সংযুক্ত কম্পিউটারের অধীনে আরো কম্পিউটার সংযুক্ত হতে পারে। তবে একটি কম্পিউটারের অধীনে কয়টি কম্পিউটার সংযুক্ত হতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট থাকে। এভাবে পর্যায়ক্রমে নেটওয়ার্ক গাছের শাখা প্রশাখার মত বৃদ্ধি পায় তাই একে ট্রি টোপোলজি বলে।

মেশ টোপোলজি (Mesh Topology)

মেশ টোপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এতে করে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ খুব দ্রুত গতিতে হতে পারে। নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার নষ্ট হলেও নেটওয়ার্ক সচল থাকে। এই নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য তার লাগে বেশি এবং খরচও বেশি হয়।

হাইব্রিড টোপোলজি (Hybrid Topology)

হাইব্রিড টোপোলজি হল একাধিক টোপোলজির সমন্বয়ে তৈরি নেটওয়ার্ক। এতে একই সাথে বাস, রিং, স্টার, ট্রি, মেশ ইত্যাদি টোপোলজি ব্যবহার হতে পারে।

নেটওয়ার্ক প্রোটোকল (Network Protocol)

নেটওয়ার্ক প্রোটোকল হল দুটি ডিভাইসের মধ্যে যে ফরম্যাটে তথ্য বিনিময় হবে। প্রোটোকলে নীচের বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়।

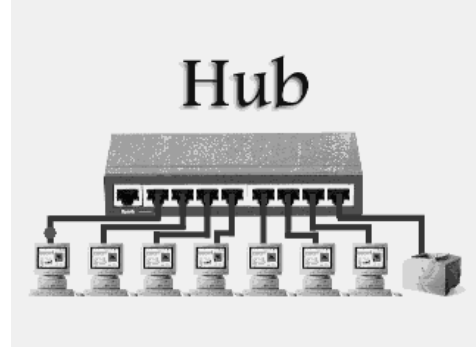
- কোন প্রকার ইরর চেকিং(ভুল শনাক্তকরণ) পদ্ধতি ব্যবহার হবে।
- ডাটা কম্প্রেশন মেথড ব্যবহার হলে তা কোন প্রকারের।
- যখন তথ্য বিনিময় শেষ হবে কীভাবে তা বোঝা যাবে।
- গ্রাহক কীভাবে জানাবে তথ্য গ্রহণ করা শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের প্রোটোকল আছে। এরমধ্যে কোনোটা দ্রুত গতির, কোনোটা সহজ আবার কোনোটা নির্ভরযোগ্য বেশি। ব্যবহারকারীর দিক থেকে জানা প্রয়োজন যে প্রোটোকল সাপোর্ট না করলে দুটি ডিভাইস যোগাযোগ করতে পারে না। বহুল ব্যবহৃত কিছু প্রোটোকল হল TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP, Token-Ring, Ethernet, Xmodem, Kermit, MNP ইত্যাদি।

বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস

হাব (Hub)

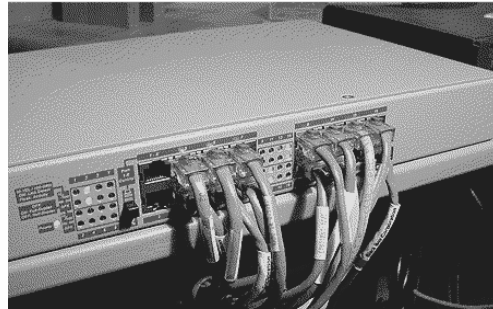
হাব একাধিক কম্পিউটারকে একটা কেন্দ্রে সংযুক্ত করার জন্য। সংযুক্ত কম্পিউটারের সংখ্যা নির্ভর করে হাবে থাকা পোর্টের সংখ্যার উপর। সংযুক্ত কোনো কম্পিউটার তথ্য প্রেরণ করলে হাব সেই তথ্য সবগুলি কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয় এবং গ্রাহক কম্পিউটার গ্রহণ করে বাকি গুলি ফেলে দেয়। হাবে সংযুক্ত সবগুলি কম্পিউটার একসাথে তথ্য পাঠাতে পারে না।



চিত্র নং- ২০ হাব

সুইচ (Switch)

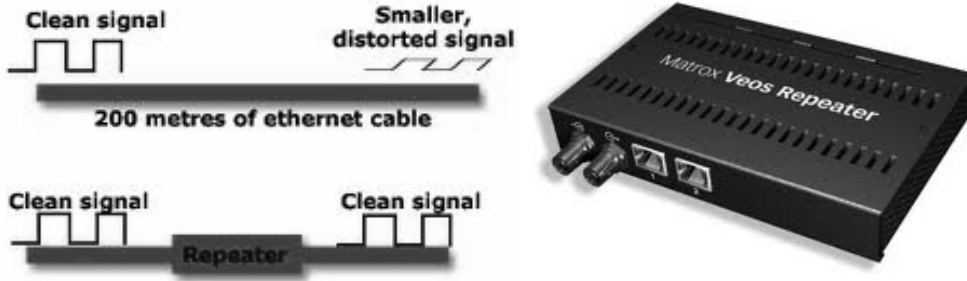
সুইচ হল বেশকিছু নেটওয়ার্ক পোর্ট সমৃদ্ধ ডিভাইস। হাবের মতই কেবল ও কানেক্টর এর সাহায্যে কম্পিউটারগুলি এই সুইচের পোর্টগুলিতে সংযুক্ত হয়। তবে সুইচ কোনো কম্পিউটার বা ডিভাইস তথ্য প্রেরণ করলে সেটা নির্দিষ্ট কম্পিউটারে বা ডিভাইসে পৌঁছে দেয়। তথ্য অযথা সবগুলো কম্পিউটারে যায় না। ফলে নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স বাড়ে এবং একই সাথে একাধিক কম্পিউটার তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। এটা ফুল ডুপ্লেক্স মোডে কাজ করতে পারে অর্থাৎ তথ্য একই সাথে যাওয়া আসা করতে পারবে।



চিত্র নং- ২১ সুইচ

রিপিটার (Repeater)

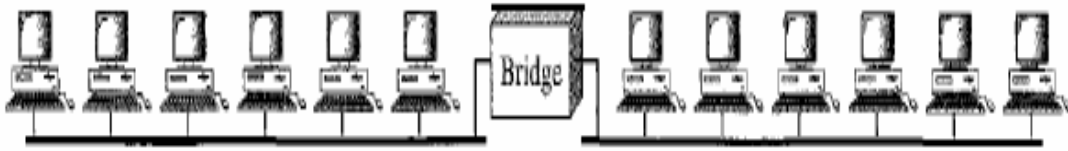
রিপিটার হল এমন একটা ডিভাইস যা সিগনালের শক্তি বৃদ্ধি করে অথবা পুনরুজ্জীবিত করে। সাধারণত একটা দূরত্বে সিগনাল দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আরও দূরে পাঠানোর জন্য এই সিগনালকে আবারও তৈরি করে প্রেরণ করা লাগে। রিপিটার এই কাজটি করে অনেক দূরত্বে সিগনাল পাঠাতে সহায়তা করে।



চিত্র নং- ২২ রিপিটার

ব্রিজ (Bridge)

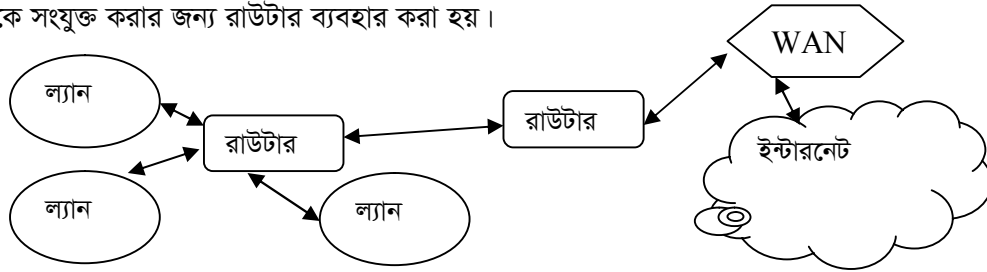
ব্রিজ হল যখন একাধিক নেটওয়ার্ক সেগমেন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য। নেটওয়ার্ককে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করার জন্যও ব্যবহার করা হয়। রিপিটার ডিভাইসের মত সিগনাল রিজেনারেশন করতে পারে।



চিত্র নং- ২৩ ব্রিজ

রাউটার (Router)

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সংযোগের জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়। রাউটার লোকাল তথ্য এবং বাইরের তথ্যের মধ্যে প্রভেদ করতে পারে। ফলে এক নেটওয়ার্কের ভেতরের তথ্য আরেক নেটওয়ার্কে যায় না। আবার অন্য নেটওয়ার্কের হলে তা ঠিক ভাবে পাঠিয়ে দেয়। রাউটারের কাজ অনেকটা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মত। তথ্যের ট্রাফিক কোন পথে যাবে তা রাউটার নির্ধারণ করে। রাউটারে যখন তথ্য আসে তা গন্তব্য পৌঁছানোর জন্য পরবর্তী সবচেয়ে ভালো গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং সেখানে তথ্য পৌঁছে দেয়। সাধারণত ল্যান এবং ওয়ানকে সংযুক্ত করার জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র নং- ২৪ রাউটার ব্যবহার

গেটওয়ে (Gateway)

তথ্য প্রেরণ গ্রহণ মূলত হয় প্রোটোকলের সাহায্যে। যখন দুটি ভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে হয় যাদের প্রোটোকল ভিন্ন তখন গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়। গেটওয়েতে যখন তথ্য আসে তা গন্তব্য নেটওয়ার্কের প্রোটোকল অনুসারে সাজিয়ে (ফরম্যাট) তারপর পাঠায়। ফলে গন্তব্য নেটওয়ার্ক তথ্যটি গ্রহণ করতে পারে। যেমন একটা মেইল গেটওয়ে সিমপল মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল (এসএমটিপি) রিকোয়েস্ট পেলে তাকে স্টান্ডার্ড x.4000 ফরম্যাটে অনুবাদ করে গন্তব্যে পাঠিয়ে দেবে।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (Network Interface Card)

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) হল কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা কম্পিউটারে ইনস্টল (স্থাপন) করতে হয়। নেটওয়ার্ক কেবল সংযোগ দেওয়ার জন্য এই ডিভাইসে সাধারণত একটি পোর্ট থাকে তবে একাধিকও থাকতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে ডিভাইসটি তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটি যদি ওয়্যারলেস হয় তবে এর সাথে পোর্টের বদলে একটি অ্যান্টেনা থাকে।



নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড



ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

চিত্র নং- ২৫ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

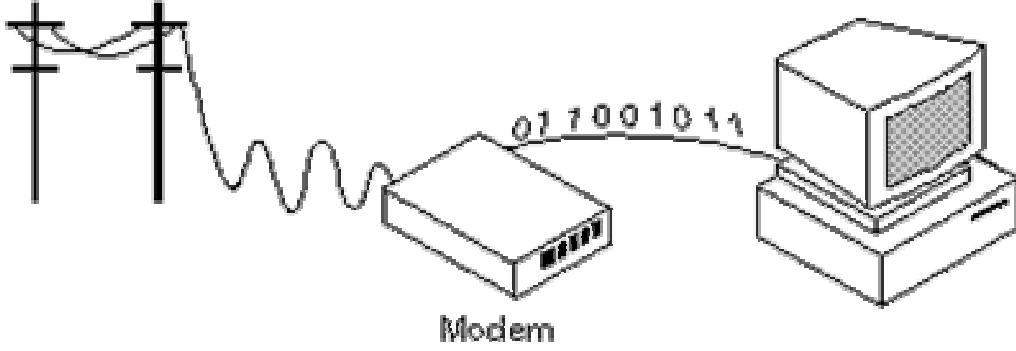
মোডেম (Modem)

মোডেমের কারণে কম্পিউটার টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে তথ্য যোগাযোগ করতে পারে। আমরা বাসার কম্পিউটার দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য মোডেম ব্যবহার করি। টেলিফোন লাইন অ্যানালগ সিগনালে কাজ করে আর কম্পিউটার কাজ করে ডিজিটাল সিস্টেমে। মোডেম কম্পিউটার থেকে পাঠানো ডিজিটাল সিগনালকে অ্যানালগে রূপান্তরিত করে ফলে সিগনাল টেলিফোন লাইনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। এই ডিজিটাল সিগনালকে অ্যানালগে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বলে মডিউলেশন। আবার অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তরিত (ডিমডিউলেশন) করে কম্পিউটারকে দেয় ফলে কম্পিউটার বুঝতে পারে। অর্থাৎ মোডেম আসলে ডিজিটাল ও অ্যানালগের মাঝে অনুবাদকের কাজ করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ক্লাউড কম্পিউটিং ধারণার মূল হচ্ছে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ারিং। কম্পিউটারের রিসোর্স হচ্ছে এর র‍্যাম এবং সিপিউ এর প্রসেসিং (প্রক্রিয়াকরণ) শক্তি। সফটওয়্যার চলে এই সিপিউ এবং র‍্যাম দ্বারা। অনেক

সফটওয়্যার চলার জন্য তাই অনেক কম্পিউটিং রিসোর্স দরকার। কোনো কোনো সফটওয়্যারের জটিল হিসাব ও ফলাফলের জন্য অনেক বেশি কম্পিউটিং রিসোর্স দরকার পড়ে। বেশি রিসোর্স লাগে এরকম সফটওয়্যার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা চালানোর জন্য শক্তিশালী কম্পিউটার কেনার প্রয়োজন পড়ে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর ধারণায় ব্যবহারকারী তার যেকোনো সফটওয়্যার সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভারে চালাবেন। সফটওয়্যার চালানোর জন্য তার নিজস্ব সার্ভার কেনা এবং



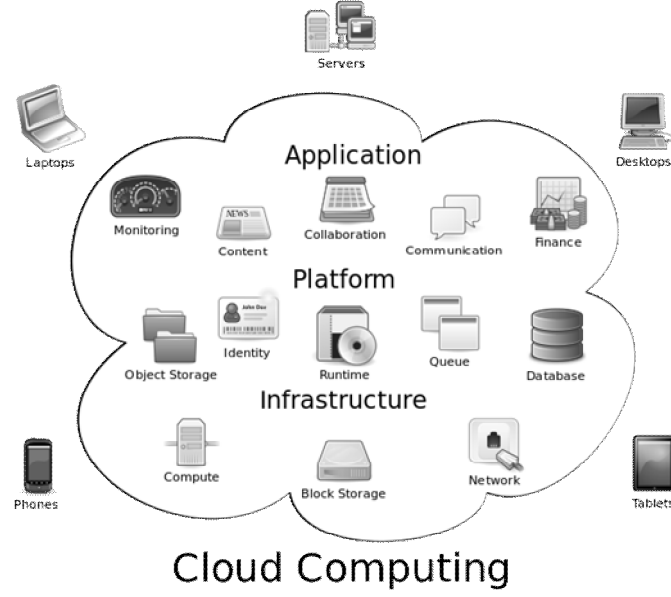
চিত্র নং- ২৬ মোডেম

চালানোর জন্য যে খরচ ও লোকবল প্রয়োজন তার প্রয়োজন পড়বে না।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্লাউড শব্দটা হল ইন্টারনেটের প্রতীকী। অর্থাৎ ক্লাউড কম্পিউটিং বলতে আসলে ইন্টারনেট ভিত্তিক কম্পিউটিংকে বোঝায়। এই ব্যবস্থায় গ্রাহক কম্পিউটার সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার ইত্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় সামরিক বাহিনী কিংবা বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে সেরকম সেরকম শক্তিশালী কম্পিউটার সিস্টেমে সাধারণ ব্যবহারকারীর ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া। ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল কথা হল ব্যবহারকারী খুব অল্প সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সুপার কম্পিউটারে সুবিধা পাবেন। এই ব্যবস্থায় ক্লাউড সার্ভিস প্রদানকারী সকল হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করে। এর প্রাত্যহিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দেখাশোনা করে সার্ভিস প্রদানকারী। গ্রাহক তার কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে ব্রাউজার বা হালকা কোনো সফটওয়্যার থেকে সার্ভিস বা সেবা গ্রহণ করবে।

অনেকেই মেইল করার জন্য গুগলের জিমেইল, ইয়াহু মেইল অথবা হটমেইল সার্ভিস ব্যবহার করে। মেইল করার জন্য ব্যবহারকারী নিজের কম্পিউটারে কোনো মেইলিং সফটওয়্যার ইনস্টল না করে ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে মেইল ব্যবহার করে। মেইলের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও স্টোরেজ থাকে দূরে কোনো সার্ভারে আমরা সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করি। এটাই হল ক্লাউড কম্পিউটিং।



চিত্র নং- ২৭ ক্লাউড কম্পিউটিং

ছবির উৎস http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ-

১. ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবহার
ক্লাউড সাধারণত ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হয়।
২. প্রয়োজন ও ব্যবহার অনুসারে ফি
ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং রিসোর্স ব্যবহার করেন এবং সেই ব্যবহার অনুসারে ফি প্রদান করেন।
৩. প্রয়োজনের সাথে বাড়ানো কমানো যায় ব্যবহারের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে ব্যবহারকারী তার রিসোর্স বড়াতে এবং কমাতে পারেন যেকোনো সময়।
৪. শক্তিশালী কম্পিউটার থেকে সেবা সার্ভিস প্রদান করা হয় সুপার কম্পিউটারের মত শক্তিশালী কম্পিউটার থেকে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রধান সার্ভিস মডেল

“Infrastructure as a Service” (IaaS)

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক, সিপিউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয় যেখানে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার চালাতে পারেন।

“Platform as a Service” (PaaS)

এই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এপ্লিকেশন ইনভায়রনমেন্ট ইত্যাদি থাকে। অ্যাপ্লিকেশন ডেভলোপাররা তার তৈরি করা সফটওয়্যার ভাড়া ক্লাউড প্ল্যাটফরমে চালাতে পারেন এই হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা ছাড়াই।

“Software as a Service” (SaaS)

এই ব্যবস্থায় ব্যবহার্য সফটওয়্যার ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন। সেজন্য সফটওয়্যার তার নিজের কম্পিউটারে ইনস্টল আপডেট করতে হবে না।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা

১. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

অল্প জনবল দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। ইউনিট প্রতি এবং প্রকল্প প্রতি খরচ কম হয়।

১. প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ সাধারণ ব্যবহার্য কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসের বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের পর প্রায়শই অবকাঠামো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ ব্যবহারকারী যতটুকু ব্যবহার করেন শুধু ততটুকুর জন্য ফি দিতে হয় তাই অনেক অপচয় রোধ হয়।

২. স্বল্প খরচে বিশ্বময় কর্মী বাহিনী

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান হতে ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করা যায়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মী থাকতে পারে সহজে।

৩. কর্ম প্রক্রিয়ার উন্নয়ন

এই ব্যবস্থায় অল্প সময়ে অল্প কর্মী দিয়ে বেশি কাজ করানো যায়।

৪. বিনিয়োগ খরচ হ্রাস

হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার জন্য বড় বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না।

৫. সহজ ব্যবহার্যতা

যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে ব্যবহার করা যায় ফলে ব্যবহার করা সহজ হয়।

৬. কার্যকর মনিটরিং

সহজে কাজকর্ম মনিটর করা যায়। ফলে বাজেট এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায়।

৭. শেখা সহজ

এই পদ্ধতিতে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার শেখার জন্য কম সময় ও ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

৮. নতুন সফটওয়্যারে খরচ হ্রাস

সফটওয়্যার সব সময় উন্নয়ন হচ্ছে। সময় কাজের সাথে তাল মেলানোর জন্য নতুন সফটওয়্যার কিনতে অনেক খরচ হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর এসব কোনো ব্যয়ভার বহন করার প্রয়োজন পড়বে না।

৯. সহজ পরিবর্তন

কাজের প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক লোকবল এবং অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত থাকে। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য এরকম বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই।

অসুবিধা

১. নিরাপত্তা- ক্লাউড কম্পিউটার যদি হ্যাকিংএর শিকার হয় তাহলে অন্য সবার সাথে ব্যবহারকারীর তথ্যের নিরাপত্তা স্বাভাবিক ভাবেই হুমকিতে পড়বে।
২. সার্ভার ডাউন- এরকম প্রায়শই ঘটে। কখনো কখনো সার্ভার মেইনটেনেন্স, হ্যাকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে ডাউন হতে পারে। সেই মুহূর্তে ওটা চালু হওয়ার প্রার্থনা করা ছাড়া ব্যবহারকারীর আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় থাকে না।
৩. স্টোরেজ লিমিট- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টোরেজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। লোকালি যত বেশি পরিমাণ স্টোরেজ ব্যবহার করা যায় অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়েও সে পরিমাণ জায়গা ক্লাউডে পাওয়া যায় না।
৪. স্লো স্পিড- বড় ফাইল আপলোড ও ডাউনলোড ধীর গতির হতে পারে।
৫. লিমিটেড ফিচার- সাধারণত ব্যবহারকারীর লোকাল কম্পিউটারে ব্যবহৃত সফটওয়্যার থেকে ক্লাউডের সফটওয়্যার-এ অনেক কম ফিচার থাকে।
৬. ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীলতা- ইন্টারনেটের কানেকশনে কোনো সমস্যা বা ধীর গতির হলে পুরো বিষয়টাই সুবিধার থেকে বড় ধরনের অসুবিধা হয়ে যাবে। যা লোকাল কম্পিউটারে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অনুশীলনী-২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। কোনটি ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদান নয়?
(ক) ম্যাসেজ (খ) সোর্স (গ) প্রাপক (ঘ) কোনোটি নয়
- ২। আমরা মোবাইল ফোনে কোন ধরনের ডাটা ট্রান্সমিশন মোড দেখতে পাই?
(ক) সিমপ্লেক্স (খ) হাফ ডুপ্লেক্স (গ) ফুল ডুপ্লেক্স (ঘ) কোনোটি নয়
- ৩। আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করি?
(ক) নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (খ) রাউটার (গ) সুইচ (ঘ) মোডেম
- ৪। ক্লাউড কম্পিউটিং এ গ্রাহক সফটওয়্যার ব্যবহার করেন।
(ক) ক্লাউডে সফটওয়্যার ইনস্টল করে (খ) ডাউনলোড করে
(গ) লাইসেন্স ফি দিয়ে (ঘ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে

সৃজনশীল প্রশ্ন

সমিরদের বাসায় দুটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার ও একটি মোডেম আছে। সমির যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন তার ভাইও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চায়। সমির যখন কিছু প্রিন্ট করতে হয় তখন তার ভাইয়ের ঘর থেকে প্রিন্টারটি নিয়ে আসতে হয়। এই অসুবিধা থেকে বাচার জন্য তাদের বাবা তাদেরকে একটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করার পরামর্শ দিল।

- ক) কম্পিউটার সুইচ কী?
- খ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করতে কী কেবল(cable) এবং কেন ব্যবহার করতে হবে?
- গ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সমির কীভাবে তৈরি করল?
- ঘ) এই নেটওয়ার্ক তৈরিতে ব্যবহৃত ডিভাইস ও টোপোলজি বিশ্লেষণ করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডাটা কমিউনিকেশন কী? ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা কর।
২. বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সমিশন মোডের তুলনামূলক আলোচনা করো।
৩. ট্রান্সমিশন মিডিয়াম কী? বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সমিশন মিডিয়ার ব্যবহার আলোচনা কর।
৪. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।
৫. বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক টোপোলজি ব্যাখ্যা কর।
৬. মেশ ও হাইব্রিড টোপোলজির চিত্র অংকন কর।
৭. ক্লাউড কম্পিউটিংএর সুবিধা অসুবিধা তুলনামূলক আলোচনা কর।